গ্র হা ন্ত রে র সু খ

কা জী জ হি রু ল ই স লা ম

গলির মাথায় যে কদম গাছটা, যার নিচে কয়েকটি উলঙ্গ শিশু এ ওর গায়ে কদম ফুল ছুঁড়ে হাতের নিশানা পরখ করছে, ওটা পেরিয়ে বড়জোর দশ পা ডানে এগুলেই রাস্তার বাঁ দিকে একটা এদো ডোবা; অর্ধেকটা রাস্তা যেখানে মনের খেয়ালে নেমে গেছে, বাকীটাও যাই যাই করছে । কদিন আগেও ডোবাটা পুষ্টিহীনতায় আক্রান্ত মানুষের মতো রুগ্ন কচুরিপানায় ঠাসা ছিলো। গত তিনদিনের অবিরাম বর্ষণে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে ওঠাতে কচুরিপানাগুলো যেন প্রাণ ফিরে পেয়েছে। ওদের মধ্যে এখন আর জড়াজড়ি ভাবটা নেই। যেন প্রতিটি পানাই ওর নিজস্ব একটা স্পেস খুঁজে পেয়েছে।

শব্দটা ওখান থেকেই আসছে। একদল সোনাব্যাঙ বর্ষার নতুন পানিতে উৎসব আনন্দে মেতে উঠেছে। এখনো টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে। বৃষ্টির জল গায়ে পড়াতে ওরা মনের আনন্দে মকপেত মকপেত শব্দে কোরাস গাইছে। প্রতি বর্ষায় আষাঢ়ে ব্যাঙের এই দলীয় সঙ্গীত শুনে বেড়ে উঠলেও আজকের সকালটি ওর কাছে অন্যরকম লাগে। শব্দের উৎস খুঁজতে ইচ্ছে করে। লোহার বড় গেইটের ডানদিকে মানুষ আসা-যাওয়ার জন্য যে ছোট একটি গেইট রয়েছে ওটা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আসে অপু। টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে এখনো। ছাতা নেয়নি ও। গালে, কপালে বৃষ্টির ছোট ছোট ফোটার স্পর্শ খারাপ লাগছে না। গলির ওপর উঠে আসতেই এক পশলা ঠান্ডা বাতাশের সাথে কদম ফুলের ভেজা ঘ্রাণ এসে নাকে লাগে। মনটা কেমন চনমনিয়ে ওঠে। আজকের সকালটি সত্যিই আলাদা।

কদমগাছের নিচের উলঙ্গ পথশিশুগুলি, যাদের একজন প্রতিপক্ষের ভয়ে দৌড়াতে গিয়ে এইমাত্র পা পিছলে কাদায় পড়ে গেলো, অপু তাকিয়ে আছে ওর পরাজিত এবং কাদো কাদো মলিন মুখটার দিকে। ঠিক তখনি হঠাৎ ভূত দেখার মতো চমকে ওঠে ও।

‘এই শোন’

আস্বাভিক, অথচ কেন যেন মনে হচ্ছে খুবই প্রত্যাশিত, ঘটনাটি ওকে চমকালো ঠিকই কিন্তু ওর ভেতরে কোথায় যেন একটা নাড়া পড়লো। রোজই এ পথ মাড়িয়ে, ঠিক এ সময়টাতেই, একটা চামড়ার ব্যাগ নিয়ে মানুষটি হাঁটতে হাঁটতে গলিটা পেরিয়ে প্রগতি সরণীতে উঠে যায়। তাহলে কি ব্যঙের ডাক শুনতে কিংবা বৃষ্টিতে ভিজতে না, ওর অবচেতন ওকে এ সময়ে রাস্তায় নামিয়েছে এই মানুষটির সাথে দেখা হওয়ার জন্য? আর এজন্যই কি আজকের সকালটি ওর কাছে অন্যরকম, আলাদা মনে হচ্ছে?

মানুষের মন বড়ই রহস্যময় আর জটিল, সবসময় হিসেব মেলানো যায় না। অপুর প্রায়ই ইচ্ছে হয় মানুষটিকে ডেকে অন্তত নামটা জিজ্ঞেস করে, কিন্তু হয়ে ওঠে না। সাহস হয় না, যা ওর চরিত্রের সঙ্গে একেবারেই বেমানান। কেমন যেন একটা ভয়ের বেড়াল ওর বুকের মধ্যে সেধিয়ে যায়, হাত-পা গুটিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। ভয়টাকে ও কিছুতেই তাড়াতে পারে না। অথচ এ পাড়ার কে না জানে অপুর দস্যিপনার কথা। সব সাহসের প্রকৃতি বুঝি একরকম হয় না। মানুষটিকে দেখলেই ভয়ের আঁড়াল থেকে একটা অন্যরকম শিহরণ জেগে ওঠে, ও কেঁপে কেঁপে ওঠে। কিসের ভয়, আর কেনইবা লোকটির সাথে কথা বলতে এতো ইচ্ছে হয়? বুঝতে পারে না অপু। এর নিশ্চয়ই শুধু মনস্তাত্বিক না, বায়োলজিক্যাল কোন কারণও রয়েছে। মিলির কথা ভাবে অপু। মিলি ওর বড় বোন। তের বছরের বড়। মিলি একবার বলেছিলো, যৌবন মানুষকে এলোমেলো করে দেয়। মনিরের সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার অনেক বছর পর মিলি একদিন অপুকে একথা বলেছিলো। যৌবন আসলে কি, অপু এখনো এর স্বরূপ আবিস্কার করতে পারেনি। তাহলে কি এরই নাম যৌবন, কোন সুদর্শন যুবকের সাথে কথা বলতে ইচ্ছে হওয়া। মিলি আরো বলেছিলো, যৌবন এসে ভর করলে নাকি সব পুরুষকেই সুন্দর লাগে। আজকাল ও লক্ষ্য করেছে, চ্যাপ্টা নাকঅলা জাপানি সাইজের দুলাভাইটাকেও ওর খারাপ লাগে না। অথচ আপুর বিয়ের পর দুলাভাইয়ের নাসিকা নিয়ে কতো রসিকতা করেছে অপু।

খরগোশ শাবকের মতো চঞ্চল পা দুটো হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো। ঘুরে দাঁড়ায় অপু। ঘুরেই স্ট্রেইট তাকালো যুবকের চোখের দিকে। তাকিয়েই গন্তব্যহীনতায় ভোগে অপু। কালো সানগ্লাসের আঁড়ালে স্থির দুটি চোখ অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা আততায়ীর মতো আরো বেশী অপ্রস্তুত করে তোলে ওকে।

কেমন যেন একটা শরীর অবশ করা ভয় ওর হৃদপিন্ডে হাতুড়ি পেটাচ্ছে। একচুলও নড়তে পারছে না ও। ইচ্ছে হচ্ছে এক্ষুণি ছুটে পালাতে। একদৌড়ে গেটের ভেতরে ঢুকে সোজা দোতলায় উঠে নিজের ঘরে ঢুকে দরোজা বন্ধ করে দিতে। অথচ ওর পাদুটো ভীষণ ভারী হয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে ওকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে, ওর দুপা যীশুর মতো পেরেক মেরে কেউ মাটির সঙ্গে গেথে দিয়েছে। এরপর একটা অজানা, অচেনা শিহরণ ধীরে ধীরে ওর পা থেকে শিরদাঁড়া বেয়ে মাথায় উঠে এলো । অপু বুঝতে পারে না ওর ভালো লাগছে না খারাপ লাগছে।

লোকটি এবার ওর দিকে এগিয়ে আসে। খুব কাছাকাছি চলে এসেছে। কালো সানগ্লাসের হাত থেকে মুক্তি পায় ওর দৃষ্টি; স্থির, গভীর দুটি চোখ।

‘কি নাম তোমার?’ খুব ছোট্ট করে ওকে প্রশ্ন করে পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চির ছিপছিপে যুবক। এতো দ্রুত প্রশ্নটা করে যে পুরো দশ সেকেন্ড ভেবে এর মর্মোদ্ধার করতে হয় অপুকে। অথবা এ-ও হতে পারে, অপু এখন আর এই মাটির পৃথিবীতে নেই, হয়ত অন্য কোন গ্রহে খুঁজছে নতুন নিবাস।

‘অপু’। একটিমাত্র শব্দ উচ্চারণ করতে গিয়েই কণ্ঠ কেঁপে ওঠে, গলায় কথা জড়িয়ে যায়। ‘আমি অমিত। এ পাড়াতেই থাকি’। অমিতের কথাগুলো আর শোনে নি অপু। পায়ের পেরেক আলগা হতেই একছুটে নিজের ঘরে পৌছে যায়। ও-কি এখন সিনেমার নায়িকাদের মতো লজ্জা ঢাকতে বালিশে মুখ লুকিয়ে বিছানায় এলিয়ে পড়েছে, নিশ্চয়ই না। অপু অন্যরকম মেয়ে।

সেই অন্যরকম মেয়েটিই এই মুহূর্তে অমিতের সমস্ত চিন্তজগৎ দখল করে আছে। মেয়েতো দূরের কথা, আজ অব্দি কোন অচেনা ছেলের সাথেও যেচে কথা বলে নি ও। আজ ওর কি হলো। মেয়েদের প্রতি ওর আজন্ম ঘৃণা কোথায় পালালো। এই ঘৃণার জন্ম হয়েছিলো একটা ভয় থেকে। শৈশবের সেই দুষ্ট ভয়টি আজো মাঝে-মধ্যে ওর সমস্ত শরীরকে সাপের মতো পেঁচিয়ে ধরে, তারপর সুযোগ বুঝে ছোবল মারে ঠিক ওর দুই ভ্রূর মাঝখানে। এতে ওর মৃত্যু হয়না ঠিকই কিন্তু মৃত্যু যন্ত্রণা হয়। সেই যন্ত্রণায় ও ছটফট করতে থাকে। ছটফটানির নীল ডানায় ভর দিয়ে বাইশ বছর আগের সেই দিনটিতে আজ আবার একবার ফিরে যায় অমিত।

মুনা আন্টির কথা যতোবারই মনে হয়েছে ততোবারই ওর চোখের সামনে বড় বড় দাঁতের এক ডাইনির ছবিই ভেসে উঠেছে, এক দয়ামায়াহীন নির্মম ড্রাকুলা। অথচ এই মুনা আন্টিই ছিলো ওর শৈশবের প্রথম বন্ধু, সার্বক্ষণিক খেলার সাথী। দিনের বেশীরভাগ সময়ই কাটতো মুনা আর ওর ছোট ভাই রুবেলের সাথে খেলা করে। মুনা অমিতের চেয়ে বছর পাচেকের বড়। অমিত তখন খুব ছোট, ছ বছরের শিশু। ওর দুচোখে রাজ্যের বিস্ময়। যা দেখে তাতেই বিস্মিত হয়। বিস্মিত হবার আশ্চর্য এক ক্ষমতা থাকে শিশুদের। ও তখন মাত্র স্কুলে ভর্তি হয়েছে। শাদা শার্ট আর নেভি ব্লু হাফ প্যান্ট পরে ও আর রুবেল হাত ধরাধরি করে স্কুলে যায়। হঠাৎ ওর খুব শখ হলো লুঙ্গি পরার। কেন যেন মনে হলো, লুঙ্গি না পরতে পারলে জীবনটাই বৃথা। অনেক কান্নাকাটির পর বাবা-মায়ের অমতে দাদু ওকে একটি লাল রঙের চেক লুঙ্গি কিনে দেয়। লুঙ্গিটা দেখতে ছিলো অনেকটা ওদের দুধঅলার কোমরে বাঁধা লাল গামছাটার মতো। কি জানি, এ-ও হতে পারে দাদু একটা বড়সড় গামছাই সেলাই করে এনে ওর হাতে দিয়ে বলেছিলেন---এই নাও তোমার লুঙ্গি। শহুরে মধ্যবিত্ত পরিবারের সব বাচ্চা ছেলেদেরই লুঙ্গি পরার একটা আগ্রহ থাকে, বাচ্চা মেয়েগুলো যেমন লুকিয়ে মায়েদের শাড়ি কিংবা ওড়না সারা গায়ে পেঁচিয়ে শাড়ি পরতে চায়। আসলে শিশুরা নিজেদের মধ্যে লুকিয়ে থাকা ভবিষ্যত পিতা-মাতাকেই খুঁজে পেতে চায়।

পোশাক বদল করে সাজতে চায় বাবা কিংবা মা। দাদুর কিনে দেওয়া লাল লুঙ্গিটা পেয়েতো মহাখুশি অমিত।

সেদিন ছিলো রুবেলের জন্মদিন। জেদ ধরলো অমিত, লুঙ্গি পরেই জন্মদিনের অনুষ্ঠানে যাবে। কিছুতেই ওকে ফরমাল ড্রেস পরতে রাজী করানো গেল না। শিশু অধিকার সংরক্ষণের জন্য তখন এতো এনজিও ছিল না। মানুষের মধ্যে এ বিষয়ে তেমন কোন সচেতনতাও ছিল না। স্কুলে শিশুদেরকে পেটানোতো ছিল এক মহৎ কর্ম। পিতা-মাতাগণ ছেলে-মেয়েকে স্কুলে দিয়ে শিক্ষককে বলতেন, হাঁড়গুলো আমার আর মাংসগুলো আপনার। কি নির্মম। কিন্তু অমিতের বাবা মা ছেলের লুঙ্গি পরার অধিকারের প্রতি শেষ পর্যন্ত সম্মান দেখালেন। লুঙ্গি পরেই অমিত ও বাড়িতে গেল। কেক কাটতে এখনো অনেক সময় বাকী আছে, স্কুল থেকে ওর অনেক বন্ধু এসেছে, খুব মজা হবে আজ। অমিতকে লুঙ্গি পরা অবস্থায় দেখে মুনা দৌড়ে এসে ওকে হাত ধরে টানতে টানতে নিজের ঘরে নিয়ে গেলো। কিশোরী মুনার তখন অনেক বান্ধবী। মুনার ঘরে ঢুকে অমিত দেখে ও-ঘরে সাত-আটজন মেয়ে, একটিও ছেলে নেই। ও বেরিয়ে আসতে চাইলে মুনা ওকে লোভ দেখায়। আজ আমরা একটি মজার খেলা খেলবো। অমিত তখনো জানে না সেই মজার খেলার খেলনা হতে যাচ্ছে ও নিজেই। মুনার নির্দেশে সবগুলো মেয়ে হাত ধরাধরি করে ঘরের মধ্যে একটি বৃত্ত রচনা করলো। বৃত্তের ভেতরে ওরা দুজন, মুনা আর অমিত। মুনা এবার ওকে বললো, অমিত তুই চোখ বন্ধ কর। চোখ বন্ধ করে অমিত। এবার বানান কর, ফোরটি নাইন, দেখবি একটা দারুণ মজার খেলা হবে। অমিত বানান করে ‘এফ ও আর টি ওয়াই......’ আর তখনি মুনা একটানে ওর লুঙ্গিটা খুলে ফেলে। লজ্জায়, অপমানে, কাঁদতে কাঁদতে অমিত ছুটে বাড়ি চলে যায়। ওর আর বন্ধুদের সাথে জন্মদিনের অনুষ্ঠানে আনন্দ করা হলো না। বাড়ি ফিরে কষ্টে, আপমানে ওর বুক ফেটে যাচ্ছিলো। কেন বাবা-মায়ের কথা শুনলাম না, এই অনুশোচনায় ওর আরো বেশী করে কান্না পাচ্ছিলো। বিস্মিত হবার ক্ষমতার মতো শিশুদের বুঝি অপমানিত হবার ক্ষমতাও তীব্র।

সেদিনের সেই দৃশ্যটি মনে হলে আজও মুনার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করে। কিন্তু কোথায় পাবে ওকে। ও-তো এখন স্বামীর সাথে জার্মানীতে বসে দিব্যি মউজ করছে, হয়ত সেই মজার খেলা আজো খেলছে।

সেই থেকে মেয়েদের প্রতি ওর আজন্ম ঘৃণা জন্মায়। আসলে প্রকৃতপক্ষে ও মেয়েদেরকে ভয়ই পায়। পারতপক্ষে মেয়েদের ধারে-কাছে ঘেষতে চায় না। এমন কি ও লক্ষ্য করেছে নিজের অজান্তেই ভাবীকেও মাঝে-মধ্যে এড়িয়ে চলে। কিন্তু কই, অপুকেতো ওর একটুও ভয় করে নি। কোত্থেকে এলো এতো সাহস। এ সাহসের উৎস কোথায়? তবে কি এরই নাম ভালোবাসা, প্রেম? আমি কি অপুকে ভালোবাসি? ভালোবাসা না-কি মানুষকে সাহসী করে তোলে। মনটা কেমন ফুরফুরে লাগছে। ভয়, ঘৃণা এই জিনিসগুলো কেমন যেনো ওর মাথা থেকে ক্রমশ মুছে গিয়ে মাথাটা হালকা হয়ে উঠছে।

অপুর অপূর্ব মুখের আদলটা, যা টি-শার্ট এবং জিনসে আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, মস্তিষ্কের রেড চেম্বার থেকে ইয়েলো চেম্বারে ঢোকাতে ঢোকাতে অফিসে ঢোকে অমিত। একবার বাঁ হাতটা বুকের কাছে তুলে ক্যাসিও ইলেক্ট্রনিক ঘড়িটাতে চোখ বুলায় ও। দশটা পনের। দ্যাট মিনস, ফিফটিন মিনিটস লেইট। বুড়ো আজ নেবে একচোট। ব্যাখ্যাতীত চরিত্রের অধিকারী এই বুড়ো। দীর্ঘ শাদা চুলগুলো সুস্পস্ট একটি সরলরেখার মতো সিথির দুপাশ থেকে কাধ অব্দি নেমে এসে ওর মুখটাতে একটি মেয়েলি কোমলতা তৈরী করেছে। সারাক্ষণ কেবল চেচামিচি, হৈ চৈ করে পুরো অফিস মাতিয়ে রাখেন ফিজিক্স-এর এই প্রবীন অধ্যাপক ড. ইশতিয়াক অহমেদ। অফিসের সবাই যার নাম দিয়েছে পাগল বিজ্ঞানী।

বাইরে যতোই হৈ চৈ চেচামেচি করুন না কেনো, পাগল বিজ্ঞানীর ভেতরটা কিন্তু ওর চুলগুলোর মতোই শাদা।

এই যে অমিত, তুমি এসেছো। চলো, ল্যাব-এ চলো। একটা দারুণ কাজ করেছি, তোমাকে না দেখালে শান্তি পচ্ছি না।

দারুণ জিনিসই বটে। গত এক সপ্তাহ আগে একটি সফল ল্যাব টেস্ট করেছেন বুড়ো। আমাদের দেশের প্রাকৃতিক বাঁশকে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট-এর মাধ্যমে স্বাভাবিকের চেয়ে দশগুন বেশী টেকসই করা যায়। ভাবা যায় একটি বাঁশের খুঁটি এখন থেকে টেকসই হবে প্রায় ত্রিশ/চল্লিশ বছর। গ্রামের দরিদ্র মানুষদের এখন থেকে আর তিন/চার বছর পরপর ঘরের খুঁটি বদলানোর মতো একটি ব্যায়সাপেক্ষ কাজ করতে হবে না। এ যে কতো বড় কল্যাণকর আবিস্কার তা কেবল ওরাই বুঝবে যারা এর বেনেফিশিয়ারি, আটষট্টি হাজার গ্রামের দরিদ্র মানুষ। মনে মনে ভাবছে অমিত ল্যাব-এ ধরে নিয়ে গিয়ে বুড়ো সেই ফর্মূলাটাই আবার দেখাবে, যা তিনি গত এক সপ্তাহে অফিসের সবাইকে কম করে হলেও দশবার করে দেখিয়েছেন। যে কোন আবিস্কারেরই একটা উচ্ছাস থাকে, কিন্তু এই ড. পাগলের উচ্ছাসটা যেন একটু বেশীই। উচ্ছাসের দাপটেই বোধ হয় দৈনন্দিন বিষয়গুলো একেবারেই মনে রাখতে পারেন না। বিলম্বে অফিসে আসার জন্য এখন অমিতকে একটা ধমক দেবার কথা ছিলো। তিনি তা দেন নি। ধমকটা যাতে পরেও খেতে না হয় সেজন্য অমিত ভাবছে, ওর কথামতো ল্যাব থেকে ঘুরে আসাই ভালো। যদিও এতে অন্তত একটা ঘন্টা যাবে। আর এছাড়া কিইবা করার আছে, এ অফিসের কার ঘাড়ে ক'টা মাথা যে ড. ইশতিয়াকের নির্দেশ অমান্য করে।

ল্যাব-এ ঢুকে ওর ধারণা সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। সত্যি সত্যি একটা দারুণ কাজ করেছেন বুড়ো। অসাধারণ আবিস্কার। লোকটার সোশ্যাল কমিটমেন্ট আছে বলতে হবে। সত্যি ও আজ যা আবিস্কার করেছে যদি

এর সঠিক এবং ব্যাপক ব্যাবহার শুরু করা যায় তাহলে দেশ অনেকদূর এগিয়ে যাবে। ক্যামিকেল রি-অ্যাকশনের মাধ্যমে মাছের কাঁটা থেকে তৈরী করা যায় জীবন রক্ষাকারী কিছু দামী মেডিসিন, শুধু তা-ই না, পচা আবর্জনা, পশুর হাঁড়, তরিতরকারীর ফেলনা অংশ এসব থেকেও তৈরী করা যায় সার, পোল্ট্রি এন্ড ডেইরি ফিড। এরপর পাগল বিজ্ঞানী যে কথাটা বললেন সেটা শোনার জন্য অমিত তৈরী ছিলো না মোটেও। হিউম্যান বর্জ্য (মানুষের গু) থেকেও নাকি সুস্বাদু খাবার বানানো সম্ভব। পৃথিবীর কোনো কোনো দেশ না-কি ইতোমধ্যেই নর্দমার পানি (মুতের পানি) পিউরিফাই করে খাবার পানিতে রূপান্তরিত করছে। অমিত জানে এরপর বুড়ো শুরু করবে তার সবচেয়ে প্রিয় বিষয় সোলার এনার্জির ওপর বক্তৃতা। সত্যিই দেশ ও মানুষের জন্য বুড়োটা বেশ ভাবেন। কিন্তু ওর ভাবনা কি কখনো বাস্তবায়িত হবে? এমন কত আবিস্কারের কথাইতো মাঝে মাঝে খবরের কাগজে বের হয়। কই, একটারওতো কোনো বাস্তবায়ন দেখা যায় না। এদেশের প্রতিভাবান মানুষেরা এভাবেই নিরুৎসাহিত হতে হতে একদিন তেলহীন প্রদীপের মতো ফুরিয়ে যায়, আর নয়তো সুযোগের সন্ধানে পাড়ি জমায় বিদেশে। দেশ ক্রমশই এভাবে মেধাশূন্য হয়ে পড়ছে। আমাদের রাজনীতি কিংবা বিচক্ষণ সরকারগুলো কি এসব নিয়ে ভাবেন, এতো সময় কই ওদের।

পৃষ্ঠা উল্টাতে চায় অমিত। পাগল বিজ্ঞানী আর অসহায় ক্ষুধার্ত, দরিদ্র মানুষের ভূখা-নাঙ্গা ছবি দিয়ে সাজানো এই কুৎসিত সমাজচিত্রটাকে চোখের সামনে ঝুলিয়ে রেখে আজকের এই বিশেষ এবং চমৎকার সলাকটাকে ম্লান করে দিতে চায় না। এই কঠিন বাস্তবতাকে এড়ানোর কোনো উপায় নাই জেনেও, অন্তত কিছুটা সময়ের জন্য ছুটি নিতে চায় অমিত। আজ শুধু একজনকে নিয়েই ভাবতে চায়। এই অনন্ত সুন্দর পৃথিবীতে, এক অনিন্দ্য সুন্দরের সন্ধান পেয়েছে ও আজ, এর পাশে পভার্টির মতো বিশ্রী শব্দটাকে কিছুতেই দাঁড় করাতে চায় না।

নিজের রুমে ঢুকে দ্বিতীয় দফায় মেজাজটা বিগড়ে গেলো ওর। টেবিলের ওপর ছোটখাটো একটা ফাইলের পাহাড়। ফাইলগুলো নেড়ে-চেড়ে দেখে অমিত। হ্যাঁ, খুব মন দিয়ে কাজ করলেও আট ঘন্টায় শেষ করা যাবে না। শালার বুড়ো পুরো বারোটা প্রজেক্টই আমার কাঁধে তুলে দিয়েছে, কলুর বলদ পেয়েছে। কষে একটা গাল দেয় ও বসকে। এটা একটা প্রফেশনাল সমস্যা। কেউ একটু দক্ষতার সাথে কাজ করলেও বিপদ আবার না করলেও বিপদ। কেউ ভালো কাজ করেছে কি আমনি তার ঘাড়ে আরো চাপাও। এদিকে যে চার/পাঁচজন দিব্যি গোঁফে তেল দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সেটা কেউ দেখছে না। মুখ ফুটে একথা বলবারও কোন জো নেই। বসদের একটাই কথা, সব কাজ সবাইকে দিয়ে হয় না। হয় না তো ওই লোকগুলোকে পুষছেন কেনো? এ নিয়ে নিশ্চয়ই ম্যনেজমেন্টের ভাবা উচিত। এখন থেকে ভুল-ভাল কাজ করে রাখবো। মনে মনে একথা বললেও অমিত তা করে না, করতে পারে না। এটা

একটা ইগোর ব্যাপার। কাজ ও মন দিয়েই করে। এবং আর সকলের চেয়ে ভালোই করে। যদিও জানে এর পুরস্কার একটাই, আরো কিছু বাড়তি কাজ।

মনে মনে গজরাতে গজরাতে রিসিভার কানে তোলে অমিত। জিরো ওয়ান, বাটন দুটো পুশ করতেই ওপাশ থেকে ড. ইশতিয়াকের ফ্যাসফ্যাসে গলা ভেসে এলো,
হ্যালো।
স্যার, বারোটা প্রজেক্টের ফাইলই আমার কাছে এসে গেছে।
ডোন্ট বি নার্ভাস মাই বয়। নো ওয়ান এলস ক্যান ডু দ্যাট ডিফিক্যাল্ট টাস্ক বাজেট স্প্রেড, এক্সেপ্ট ইউ। আমি জেনেশুনেই সবগুলো প্রজেক্টের ফাইল তোমার কাছে পাঠিয়েছি।
খুব ভালো করেছেন স্যার। নইলে আমার বারোটা বাজাবেন কি করে।

শেষের বাক্যটি আর ভাষা খুঁজে পায় না। অমিতের ভেতরেই ফাল্গুনি হাওয়ার মতো পাক খেতে খেতে মিলিয়ে যায়। ওপাশ থেকে রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দ হতেই অমিত রিসিভার নামিয়ে রাখে। আর তখনি ফাইলপত্রের আঁড়াল থেকে একটি টিকটিকি টিকটিক শব্দে ডেকে ওঠে। অমিত চেয়ার থেকে উঠে গিয়ে সিলিং ফ্যানের হাওয়াটা বাড়িয়ে দেয়। ওর মুখোমুখি সিটে বসা রফিক সাহেব তখন ওর দিকে তাকিয়ে একটি রহস্যময় হাসি হাসে। এতে ওর আরো মেজাজ খারাপ হয়। ও জানে এই হাসিতে কোনো এপ্রিসিয়েশন বা সহানুভূতি নেই, আছে তামাশা দেখে মজা পাওয়া। একাউন্টস অফিসার রফিকউদ্দিন এবার নিজের সিট থেকে উঠে এসে অমিতের টেবিলের সামনে রাখা হাতলবিহীন কাঠের চেয়ারটাতে বসে। ওর বসার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে তুলতুলে একটি সোফায় বসেছে, বসে খুব আরাম পাচ্ছে। মুখে কোনো কথা নেই রফিকউদ্দিনের, একটা মিচকে হাসি ওর ঠোঁটের কোনে ঝুলিয়ে রেখে তাকিয়ে আছে অমিতের দিকে।

কিছু বলবেন?
জ্বী না।
ও আচ্ছা।

লোকটা তবু বসে আছে, অথচ কিছু বলছে না। অমিতের কাছে মনে হয় ওর নাকের ওপর একটা মাছি বসে আছে। ও আবার জিজ্ঞেস করে।

কিছু বলবেন রফিক সাহেব?
জ্বী না।

একটা কথা জিজ্ঞেস করি, আশা করি ঠিক ঠিক জবাব দেবেন। আপনার নাকের ওপর কখনো মাছি বসেছে?

রফিক কোন জবাব দেয় না। ভোতা মুখ করে বসে আছে। এটা ভোতা মুখ দেখার সময় না। অমিতের বিরক্তি এবার ছাদ ছোয়।

রফিক সাহেব আপনার কি মাথায় কোনো সমস্যা হয়েছে?

জ্বী না মাথা ঠিকই আছে। একাউন্টস মিলে গেছে।

তো এবার মিষ্টি খাওয়ান। অমন ভোতা মুখ করে বসে আছেন কেন?

মিষ্টিতো খাওয়াবেনতো আপনি জনাব।

আমি মিষ্টি খাওয়াবো? কেনো?

আশে-পাশে এতো কথা হচ্ছে আপনি কিছু শোনেন না?

কি কথা? গলাটা বাড়িয়ে রফিকের প্রায় কানের কাছে মুখ এনে বলে অমিত, *কারো বিয়ে শাদী লাগলো না-কি?*

লাগে নি, তবে লাগবে।

ঠিক আছে। সব ঠিকঠাক হয়ে গেলে নিমন্ত্রণ করবেন, গিয়ে খেয়ে আসবো। এবার কি আপনি দয়া করে নিজের সীটে যাবেন, আমি একটু কাজে মন দিতে চাই।

হ্যা, তাই দিন। দুদিন পর যখন ইডি হচ্ছেন।

কথাটা বলেই চেয়ার থেকে উঠে যায় রফিকউদ্দিন। নিজের সীটে না গিয়ে সে সোজা রুম থেকে বেরিয়ে অফিসের বারান্দার দিকে হাঁটতে থাকে। রফিকের পেছন পেছন উঠে বারান্দায় যায় অমিত। রফিক একটা সিগারেট ধরিয়েছে, অমিতও একটা সিগারেট ধরায়। সিগারেটে টান দিয়ে বারান্দার গ্রিলের কাছে ঠোঁট নিয়ে গ্রিলের ফাঁক দিয়ে ধোয়া ছাড়ে ও। রফিককে দেখে মনে হচ্ছ ও অমিতের জন্য অপেক্ষা করছে এবং এক্সপেক্ট করছে অমিত ওকে কিছু জিজ্ঞেস করবে।

কি বললেন রফিক সাহেব? আমি কথাটার মানে ঠিকমতো বুঝলাম না। গ্রিলের ফাঁক দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে কথা বলে অমিত। ওখানে এখন ঘন মেঘ। তবে টিপটিপ বৃষ্টিটা আর পড়ছে না।

বুঝেছেন আপনি ঠিকই চৌধুরী সাহেব। ডুবে ডুবে জল খাচ্ছেন আর ভাব দেখাচ্ছেন কিছুই বুঝতে পারছেন না।

এরপর ওর উত্তেজিত হবার কথা। রফিককে একটা চড় মারতে না পারলেও ‘শুয়োরের বাচ্চা’ বলে গাল দেবার কথা। কিন্তু অমিত এসবের কিছুই করে না। বরং আগের চেয়ে আরো বেশী ঠান্ডা গলায় বলে, আমি সত্যিই কিছু বুঝতে পারছি না। *ইট মাস্ট বি অ্যা জোক। ইজ’ন্ট ইট?*

অমিত ক্ষেপছে না দেখে রফিক বিরক্ত হয়। পরাজিত হওয়া চলবে না, এইরকম একটা প্রতিজ্ঞা ওর কণ্ঠে, *নট অ্যাট অল, আই মেন্ট ইট।*

এবার অমিত কিছুটা ক্ষেপে যায়, *হোয়াট ডু ইউ মিন বাই দ্যাট? আমি ইডি হচ্ছি এর মানে কি?*
ইডি মানে বুঝলেন না। এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর। দি এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর অব সোশ্যাল এওয়ারনেস এন্ড রিসার্চ সেন্টার।
কি সব বাজে বকছেন। আমি কি ওই পাগলের ছেলে না জামাই যে আমাকে ইডি বানাবে? এ দেশে উত্তরাধিকার ছাড়া কিছু হয় না, একথা আমি যেমন জানি, আপনিও জানেন।
জানি বলেইতো বলছি।
আবারও হেয়ালী করছেন, কি জানেন বলেইতো বলছেন? কি জানেন, কি জানেন আপনি?
ওই যে বললেন, উত্তরাধিকার না হলে কিছু হয় না।
তো?
তো আর কি। ওই, উত্তরাধিকার....

অমিত এবার বিষয়টা আঁচ করতে পারে। স্যারের মেয়ে নায়লাকে নিয়ে কিছু একটা লিংক আপ করতে চাইছে রফিকউদ্দিন। এতো জঘন্য কেন হয় মানুষ? এদের হয়েছে 'নেই কাজ তো খই ভাজ' অবস্থা। সময় কাটাবার জন্য একটা রসঘন বিষয় দরকার। পরচর্চা অফিস-আদালতের একটি উত্তম বিনোদন। সিগারেটের বাটটাকে টোকা মেরে শূন্যে উড়িয়ে দিয়ে নিজের সীটে ফিরে আসে অমিত।
ফাইলগুলো একপাশে সরিয়ে রেখে দুহাতে মাথাটাকে চেপে ধরে হাতের কনুই দুটি সমান্তরালভাবে টেবিলের ওপর রেখে ভাবনার সাগরে তলিয়ে যেতে চায় অমিত। আজ সারাদিন ও শুধু অপুকে নিয়েই ভাবতে চায়। সব কাজ ভেস্তে যাক আজ। ভালোবাসার কাছে আজ সবকিছুর পরাজয়।

আচ্ছা আমি কি অপুকে ভালোবাসি?
অবশ্যই। কনকর্ডের গতিতে শব্দটা ওর ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে।
কেমন ভালোবাসি?
ভীষণ।
ভীষণ কতটুকু?
পৃথিবীর কোন পরিমাপের যন্ত্র দিয়ে যা মাপা যায় না, ভালোবাসা পরিমাপের কোন একক নেই, ভালোবাসার কোন পরিমাপ হয় না।
অপু মেয়েটা দেখতে কেমন?

খুব সুন্দর। অপূর্ব। হোয়াইট টি শার্ট আর ব্লু জিনসে ওকে মনে হচ্ছিলো নীল সমুদ্রের একফালি ঢেউ। যাকে দেখলেই বুকের ভেতর ভালোবাসার বীজ অঙ্কুরিত হয়, বিকশিত হয়, ডালপালা মেলে দেয় শূন্যে, খোলা আকাশে।

অপু কি আমাকে ভালোবাসে?

মুখভর্তি বাতাশ নিয়ে গাল দুটো পটকা মাছের মতো ফোলায় অমিত। ঠোঁট দুটো উল্টে নিয়ে ডানহাতের মধ্যাঙ্গুল দিয়ে সেগুন কাঠের টেবিলের ওপর পরপর কয়েকটা টোকা দেয়। ওর ভেতরে বসে থাকা উত্তরদাতা কোন উত্তর দিতে পারছে না। কেটে যায় আরো খানিকটা সময়। হঠাৎ করে একটু অস্বাভাবিক শব্দ করেই বলে ওঠে ও, অবশ্যই। ঠিক পর মুহূর্তেই হাওয়া বেরিয়ে যাওয়া বেলুনের মতোই চিমসে যায়, কুঁকড়ে যায়। একটা হতাশা এসে ভর করে ওর মুখের মানচিত্রে, মানচিত্রটি ক্রমশ বিবর্ণ হয়ে ওঠে।

সকালের ঘটনাটাকে রিওয়ান্ড করে আবার একটু দেখতে চায় ও।

অপুর নিস্পাপ, নিস্পলক, নিরহংকার, নির্নিমেষ নেত্রযুগল স্মৃতির উজ্জ্বল আরশীতে স্পষ্ট দেখতে পায় অমিত। দ্বিধাহীন তাকিয়ে আছে ওর চোখের দিকে। কতক্ষণ এভাবে তাকিয়েছিলো ওরা পরস্পরের নেত্রযুগলের প্রতি? পাঁচ, দশ, পনেরো মিনিট? নাকি আরো বেশী। পনের মিনিট। এক বিজ্ঞ অঙ্ক বিশারদের মতো ঝটপট জবাব দেয় ওর ভেতরের মানুষ। কারণ আজ অফিসে আসতে পনের মিনিট লেইট হয়েছে। অপু নিশ্চয়ই আমাকে ভালোবাসে। তা না হলে ওভাবে তাকিয়ে থাকবে কেন। ও যখন ছুটে পালালো, লোহার গেইট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলো, দৃষ্টির আঁড়াল হলো, তখন ওর পায়ে ছিলো লজ্জার জড়তা। ওতে অবজ্ঞা ছিলো না, প্রত্যাখ্যানের কোন আভাস ছিলো না। আত্মসন্তুষ্টি পেতে চায় অমিত। তাছাড়া অমন নিস্পলক তাকিয়ে থাকলো কেনো? ওর চোখেতো প্রিয়তম আত্মসমর্পনের একটি নির্লিপ্ত সুখের উঁকিই মাথা তুলছিলো। তা ছাড়া জিজ্ঞেস করতেই নাম বললো কেনো?

বা-রে, একজন ভদ্রলোক নাম জিজ্ঞেস করলে বলবে না?

নাহ। কোন কূল কিনারা খুঁজে পাচ্ছে না ও। আসলে প্রেম কি? ভালোবাসার সংজ্ঞা কি? এসবের ছাই মাথা ও কিছুই জানে না। নিজেকে কষে একটা গাল দিতে ইচ্ছে করে। তুমি একটা আস্ত আহাম্মক অমিত চৌধুরী। শুধু শুধু জীবনের এতোগুলো বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের সিঁড়ি ভেঙেছো, এতোগুলো বসন্ত পার করেছো, পৃথিবীর আলো বাতাশে নিঃশ্বাস নিয়েছো।